

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৮ জুন, ২০২২

৪৫ বর্ষ ২৬ সংখ্যা ২৭ জুন, ২০২২, সোমবার, ১২ আষাঢ়, ১৪২৯

বর্ধমান সদরের রাইপুরে ৮ সিপিআই কর্মী স্মরণে মিছিল ও সমাবেশ



নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ জুন : সিপিআই(এম) বর্ধমান সদর ১ ও সদর ২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে আজ রাইপুর গ্রামে প্রায় ৮ জন গঙ্গাধর দে, সাধন মল্লিক, শঙ্কর পাত্র, রঘুনাথ কোঁড়া, সিদ্ধেশ্বর দলুই, সোনা হাজরা, ক্ষুদিরাম সাঁতরাঙ্গের স্মরণ করা হয়। স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন সিপিআই(এম) বর্ধমান সদর-২ এরিয়া কমিটির সম্পাদক জহর দত্ত। বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী, খেতমজুর ইউনিয়নের নেতা গণেশ চৌধুরী, বর্ধমান সদর-১ এরিয়া কমিটির সম্পাদক মুণাল কর্মকার। আভাস রায়চৌধুরী বলেন এই আটজন প্রয়াতের স্মরণ করছি কারণ তাদের কাজ কর্মকে স্মরণ করছি। এই আটজন গুণী নিজেদের জন্য বাঁচেননি। বেঁচে ছিলেন শ্রমজীবী জনগণের লড়াই-এর কাজের মধ্য দিয়ে।

বেঁচে ছিলেন সমাজের সৃষ্টিশীল কাজের মধ্য দিয়ে, আসলে একা বাঁচার বিরুদ্ধে সমষ্টিগত বাঁচার জন্যই এই কর্মেরডারা কাজ করেছেন। শ্রমজীবী জনগণের লড়াই গরিবের পক্ষপাতি তৈরি করার লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সভার আগে বালিয়ারা থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়। মিছিল শেষ হয় রাইপুর ঘাটে। মিছিলে নেতৃত্বদেন আভাস রায়চৌধুরী, গণেশ চৌধুরী, মহবুব আলম, জহর দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। গত ২০ জুন বর্ধমান ২ ব্লক ডেপুটেশন ও মিছিল থেকে ফেরার সময় সিপিআই(এম) বর্ধমান সদর-২ এরিয়া কমিটির সদস্য শিক্ষকনেতা বাসুদেব দত্তের উপর গঙ্গামোড়ে রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করে তৃণমূল গুণ্ডা বাহিনী। তারই প্রতিবাদে আজ প্রতিবাদ মিছিল হয়।

সমাজকর্মী গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সভা



কালেক্টরালয় প্রতিবাদ সভার ছবি।

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ জুন : সমাজকর্মী তিস্তা শীতলবাদ ও প্রাক্তন পুলিশ অফিসার শ্রীকুমার-এর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে জেলা জুড়ে মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। আজ বর্ধমানে এস.এফ.আই.-এর নেতৃত্বে ছাত্ররা পার্কাস রোড মোড় থেকে কার্জনকেট পর্যন্ত মিছিল করে এবং অবিলম্বে অগ্নিপথ প্রকল্প বাতিল ও মানবাধিকার কর্মী তিস্তা শীতলবাদের মুক্তির দাবিতে পথ অবরোধ করেন। এখানে প্রধানমন্ত্রীর কুশ পুস্তিকাও দাহ করা

হয়। সীমাহীন দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি, সাম্প্রদায়িকতা, অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে কালেক্টরালয় বাজারে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিপিআই(এম)-এর পূর্বস্থলী-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এই সভায় বক্তব্য রাখেন সরোজ দাস, সুমন্ত মুন্ডারী, কার্তিক দাস, বিনকাশিম সেখ, বীরেশ্বর নন্দী, প্রদীপ কুমার সাহা প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন, রণজিৎ মাহাতো। কালনা, কাটোয়া সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তেই এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি শারদ সংখ্যা-২০২২

প্রকাশিত হবে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের শেষে।

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২২।

ইউনিকোডে কম্পোজ করে মেইল-এ পাঠানো যাবে। অথবা সরাসরি ডাকযোগে পাঠান পত্রিকা দপ্তর ৬২ বি সি রোড অনিতা সিনেমা লেন বর্ধমান-১ ঠিকানায় E-mail : sharadiyanc@gmail.com

বিরোধী ঐক্যকে জোরদার করতেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সর্বসম্মত বিরোধী জোটপ্রার্থী : সেলিম



নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ জুন : রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আর.এস.এস. বিজেপি'র গেমপ্ল্যান রুখতে বিরোধী ঐক্যকে আরো দৃঢ় করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে গোটা দেশে যেমন বিজেপি-বিরোধী লড়াই চলছে চলবে তেমনি রাজ্যে তৃণমূল-বিজেপি লড়াই হবে। এখানে কোনো ছাড় নেই। একথা সিপিআই(এম) কর্মীদের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন পার্টির রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। সেলিম এদিন বলেছেন মোদী চাইছে বিরোধী শূন্য দেশ মমতা বলেছে বিরোধী শূন্য রাজ্য। বিজেপি মানুষের মননে হিন্দুত্ববাদ ঢুকিয়ে দিতে দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র ও প্রচার ব্যবস্থাকে কাজে লাগাচ্ছে। এরফলে আক্রান্ত হচ্ছে গণতন্ত্র, রাজনৈতিক পরিবেশও। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারী, অনাহার মানুষ যখন

চরম সংকটে বুলডোজার আমদানী করেছে বিজেপি। তিনি মনে করিয়ে দেন বুলডোজার হিন্দুত্ববাদেরই একটা প্রতীক। এর বিরুদ্ধে বৃন্দা কারাত সহ মহিলারা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ব্যপকতর মহিলা গরিব মানুষকে চেতনা দিয়ে রুজি-রুটির লড়াইয়ে নিয়ে আসতে হবে আমাদের। সারা দেশের কৃষক আন্দোলনের তুলনা টেনে তিনি বলেন, স্বৈরশাসন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কৃষকদের পাশাপাশি মহিলারাও অংশ নিয়েছিলেন। ধর্মঘট, হরতাল, সংগ্রামে পুরোভাগে থেকেছেন মহিলারাও। এদিন সংস্কৃতি প্রক্ষাগৃহে আলোচনা সভায় এছাড়া বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী। সভাপতি ছিলেন অমল হালদার। পার্টির আশু কর্মসূচি সম্পর্কে

বলেছেন সৈয়দ হোসেন। এদিন উপরিউক্ত চার নেতৃত্ব ছাড়াও হাটেন অঞ্জু কর, অচিন্ত্য মল্লিক সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

এদিন বর্ধমান সংস্কৃতি প্রক্ষাগৃহে আলোচনাসভায় চুক্তিভিত্তিক সেনা নিয়োগ অগ্নিপথ বাতিল করার দাবিতে বিশাল মিছিল হয়। সেই মিছিলেও ছিলেন মহম্মদ সেলিম সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। মিছিল নেতাজী মূর্তির সামনে থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় বর্ধমান স্টেশন চত্বরে। এই সভাতেই দার্জিলিং'এ মহকুমা পরিষদের নির্বাচনের জন্য মহম্মদ সেলিমের হাতে জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন ৬০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। অন্যদিকে বর্ধমান সদর এলাকার সিপিআই(এম) কর্মী সুরভ ভট্টাচার্য গণশক্তি তহবিলে পাঁচ হাজার টাকা সেলিমের হাতে দিয়েছেন।

কৃষি আমাদের সম্পদ কৃষক আমাদের গর্ব

কৃষকবন্ধু (নতুন) প্রকল্পসহ অন্যান্য সরকারি সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সারা রাজ্যব্যাপী কৃষকবন্ধু (নতুন) প্রকল্পে চলতি খারিফ মরশুমের জন্য ৮৯ লক্ষ কৃষককে মোট ২৩৮৫ কোটি টাকা সহায়তা প্রদানের শুভারম্ভ করবেন।

এর পাশাপাশি কৃষি যন্ত্রায়ণ, কৃষকবন্ধু (নতুন)-মুতাজনিত সহায়তা, বাংলা কৃষি সেচ যোজনা, কৃষি পরিকাঠামো তহবিলসহ বিভিন্ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত উপভোক্তাগণকে সরাসরি সহায়তা প্রদান করবেন।

স্থান: গোদার মাঠ, নবাবহাট মোড়, বর্ধমান | তারিখ: ২৭ জুন ২০২২
সময়: দুপুর ২.৩০

কৃষি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নতুন চিঠি

২৭ জুন, ২০২২

পঞ্চদশ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কার্যকাল শেষ হচ্ছে ২৪ জুলাই। তাই পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের উদ্যোগ শুরু হয়ে গেছে। এন.ডি.এ প্রার্থী হচ্ছেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন রাজ্যপাল বিজেপির আদিবাসী মহিলা মুখ দ্রৌপদী মুর্মু। এন.ডি.এ-র নিজস্ব ভোট প্রায় ৪৮ শতাংশ। তার সঙ্গে প্রার্থীর মহিলা ও আদিবাসী এই দুই পরিচিতিসত্তাজনিত আবেগ আছে। প্রার্থী নির্বাচনে মোক্ষম রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে বিজেপি তাই দ্রৌপদী মুর্মুকে বেছে নিয়েছে। বিজেপি বিরোধী ১৭টা দল প্রার্থী করেছে প্রাক্তন আমলা, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যশোবন্ত সিনহাকে। এমন নয় যে তিনি ছিলেন প্রথম পছন্দের। শারদ পাওয়ার, ফারুক আবদুল্লা ও গোপালকৃষ্ণ গান্ধী প্রার্থী হতে অসম্মত হওয়ায় চতুর্থ হিসেবে যশোবন্ত সিনহার নামে ঐক্যমত হয় এবং তিনি বামদলের দাবি মতো তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়ার দাবি মেনে নেওয়ায় বামেরা তাঁর প্রার্থীপদ সমর্থন করার কথা ঘোষণা করে।

বাম শিবিরে যশোবন্ত সিনহাকে প্রার্থী করা নিয়ে সঙ্গত বিতর্ক উঠেছে। আপত্তির প্রধান কারণ তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা। তিনি বিজেপি সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন তাই তিনি বিজেপি-বিরোধিতায় কতটা আন্তরিক সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গে বামেরা তৃণমূল ও বিজেপি উভয়ের বিরুদ্ধে লড়ছে। যশোবন্ত সিনহা বিজেপি ছেড়ে ২০২১-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলে যোগ দেন। এমন একজনকে রাষ্ট্রপতি পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বামেরা সমর্থন করবে কেন? তৃতীয়ত, প্রাক্তন হলেও প্রধান দুই প্রতিপক্ষের সঙ্গে ‘ঘর করা’ বিতর্কিত ব্যক্তিত্বকে রাষ্ট্রপতি পদে বামেরা সমর্থন করলে বাম-সমর্থকদের কাছে ভুল বার্তা যাবে, পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতা তাদের বোঝানো শক্ত হবে। সবকটি আপত্তিই সঙ্গত এবং যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র অক্ষুন্ন রাখা যদি বর্তমানের চ্যালেঞ্জ হয়, বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতির আবেগবর্জিত বিশ্লেষণ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

সিপিআই(এম)-এর ২৩তম পার্টি কংগ্রেসে রাজনৈতিক লাইনে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজেপিকে ‘বিচ্ছিন্ন ও পরাস্ত’ করাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তার জন্য ‘সমন্বিতভাবে’ দলগুলির সার্বিক ঐক্য প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ‘সমন্বিতভাবে’ দল বলতে যারা ঘোষিতভাবে হিন্দু সম্প্রদায়িকতার বিরোধী। একথা সত্য সব দল সমানভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করে না। কিন্তু কংগ্রেস সহ অন্য সহযোগী দলগুলি যে বিজেপি মার্কা আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদী নয়, সেটা মানতেই হয়। তাছাড়া বিধানসভা লোকসভায় প্রতিনিধি কম থাকায় প্রার্থী নির্বাচনে দর কষাকষির জায়গাতেই নেই বামশক্তি। সেক্ষেত্রে অন্য দলগুলি যে প্রার্থীকে মেনে নিতে প্রস্তুত তাকে সমর্থন না-করলে, বিজেপি বিরোধিতায় বামেরা আন্তরিক নয়, এই অভিযোগ উঠতে বাধ্য। অন্য বিকল্প বেছে নিলে, অর্থাৎ উভয় প্রার্থীর কাউকেই সমর্থন না করলে জাতীয় রাজনীতিতে আরো বিচ্ছিন্ন, আরো ক্ষীণবল হতো বামশক্তি। সে হতো এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। মতাদর্শের শুদ্ধতার পরীক্ষায় বামশিবির কখনো ফেল করেনি। কিন্তু দু’আড়াই শতাংশ ভোট নিয়ে বিরোধী ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে এন.ডি.এ প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত ও সহজ করে দিলে, মতাদর্শ ভালো বলে ইতিহাস কখনো বামপন্থীদের ক্ষমা করবে না। অন্যরা সামিল না-হলে ‘একলা চলো রে’ নীতি হিসেবে ভালো। নীতিকে বর্জন নয়, বহুজনগ্রাহ্য করে তোলাই রাজনীতি। তার জন্য যে ধৈর্য ও সংকল্প প্রয়োজন, বামদলের তা আছে, এটাই ভরসা।



৩০ জুন হল দিবস। হল দিবস পালনের প্রস্তুতি চলছে জেলা জুড়ে সারা ভারত কৃষকসভা ও পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের উদ্যোগে। ২৬ জুন পূর্বস্থলীর সুলুন্টু এম.বি.সি ইন্ডাস্ট্রি হল দিবসের প্রস্তুতির ছবি তুলেছেন আলেক্স সেখ।

বৃক্ষ রোপন ও রক্ত দান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি : দক্ষিণ মেমারি সুলতানপুর স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে। সকাল ১০টা নাগাদ সুলতান পুর ক্লাব প্রাঙ্গণে ১০টি বৃক্ষ রোপন ও একটি রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে মোট ৭০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। শিবিরের উদ্বোধন করেন মেমারি পৌরসভার পুরপিতা স্বপন বিষয়ী, রক্ত সংগ্রহ করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। রক্তদানের পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ ও পৌরসভার পক্ষ থেকে তৈরি করে দেওয়া সুলতান পুর গ্রামে কবর স্থানে একটি টিনের শেড ও উদ্বোধন করেন স্বপন বিষয়ী। অনুষ্ঠানে ছিলেন, পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান সুপ্রিয় সামন্ত, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বসন্ত রুইদাস, মেমারি থানার ওসি সুদীপ্ত মুখার্জি, ক্লাব সেক্রেটারি মুকুল রহমান ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

হল দিবস

শিবানন্দ পাল

১৮৫৫ সালে ৩০ জুন শুরু হয়েছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ। সাঁওতালদের জাত্যভিমান ও গৌরবের দিন ৩০ জুন, এই দিনকে স্মরণ করে হল দিবস পালিত হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে একটু খোঁজখবর করতে গিয়ে অনেক অজানা বিষয় জানতে পেরেছি। যেমন সাঁওতাল নারী যোদ্ধার কথা। বীরঙ্গনা সেই নারীর পরিচয় সম্পর্কে যতটা সম্ভব জানবার চেষ্টা করেছি। যতটা জানতে পেরেছি তার বিস্তৃত উল্লেখ আছে আমার বই ‘সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাঁওতাল বিদ্রোহ’-তে। সম্প্রতি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আদিবাসী ছাত্রী বইটি পড়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অনুরোধ করে বলেন যে, তিনি দিল্লি থেকে বিশেষভাবে নির্দেশ পেয়েছেন এই বিষয়ে সাঁওতালি ভাষায় লেখার জন্য। সেজন্য তিনি নারী যোদ্ধাদের বিষয়ে আরও জানতে ইচ্ছুক, তাঁকে যেন আমি সাহায্য করি!

সাঁওতাল রমণী বীরঙ্গনা রক্ষিনী সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সাথে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন। ফুলো, ঝানো, সিধুর স্ত্রী সুমি, হাড়মা মাঝির স্ত্রী মুনিয়া, হাড়মা মাঝির পুত্রবধু কাঞ্চনি, সিধু-কানুর দূর সম্পর্কিত বোন মাকু (মানকি অথবা জনকি) ছাড়াও দেবী চন্দ্র নামে জনৈক ব্যক্তির দুই কন্যা সাঁওতাল বিদ্রোহে স্বতস্ফূর্তভাবে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এর বাইরেও অসংখ্য নারী শিশুসহ কারান্তরালে মৃত্যুবরণ করেছেন, এমনকি ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হয়েছে নারীদের এমন বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া গেছে। মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ১৯ জন সাঁওতালকে হাজির করা হয়। তাদের মধ্যে দুজন ছিলেন মহিলা। নাম রাখা এবং হীরা। এরা আহত ছিলেন। ১৮৫৫-র ৩০ নভেম্বর একটি পরে জানা যায় ৪৫ জন সাঁওতাল মহিলাকে শিশু সন্তান সহ বীরভূম জেলে আটক রাখা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল দৃষ্টপোষ্য শিশু। তারা ডিসেম্বিতে ভুগছিল। সিভিল সার্জন জেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওদের ছেড়ে দিতে অনুরোধ করে, নইলে সকলেই মারা পড়বে। বিচারক ১৩ জনকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে জেলের বাইরে গিয়ে তারা বেঁচেছিল কিনা কোনো তথ্য নেই।

তথ্য প্রমাণ বলতে যে সমস্ত দলিল দস্তাবেজ বিভিন্ন ঐতিহাসিক, গবেষকদের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে ও সাহিত্যের পাতায় যা পাওয়া গেছে, আর আর্কাইভে যেটুকু পাওয়া গেছে, তাই সম্বল। এই পোড়া দেশে ঐতিহাসিক দলিল যথায়তভাবে সংরক্ষিত হয় বলে মনে হয়নি। বরং সেই ধরনের মহা মূল্যবান সম্পদকে বিকৃত করে ইতিহাস গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। তবে ঘাঁটিঘাঁটি করলে এখনও পাইলেও পাইতে পারি অমূল্য রতন। যাক সে কথা! রক্ষিনী বা রুকনি আর টুকনি ছিল দুই বোন। বাবার নাম বিশু মাঝি। সাঁওতালদের ‘মাঝি’ পদবি হলো নিজস্ব গোষ্ঠীগত পদাধিকার। সমাজপতি হিসেবে তার সিদ্ধান্ত সমষ্টিগতভাবে সকলে মান্য করে। পদবি বলতে সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি তা হলো ওদের টুড়, মুর্মু, হেমরম ইত্যাদি। বারহেটের অন্তর্গত তিলাবনি বা তিলাবাদ গ্রামে রক্ষিনীদের বাস ছিল।

তিলাবনি গ্রামের অবস্থান ভগনাডিহির পাশে। রক্ষিনীরা ছিল পাঁচ ভাইবোন। রক্ষিনীর দাদার নাম লাল। তারপরে ফুল, টুসকি, রুকনি আর টুকনি চার বোন।

কেউ কেউ বলেছেন ফুল বা ফুলোর সাথে সিধুর আর টুসকির সাথে কানুর বিয়ে হয়েছিল এই হিসেবে রুকনি সিধুর শ্যালিকা। কিন্তু সিধুর স্ত্রী হিসেবে



‘সুমি’ নামটি প্রতিষ্ঠিত। ফুলো-র বিবাহ পরবর্তী নাম সুমি হলেও হতে পারে। কিন্তু কানুর বিবাহ হয়নি। সিধুর বাবা চুনু মুর্মুর যে বংশলতিকা পাওয়া গেছে, তা একথা সমর্থন করে।

বিশু মাঝির ছেলে লাল মাঝি ভালোবেসেছিল সিধুর দূর সম্পর্কের বোন মানকিকে। কিন্তু ওদের বিয়েতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধর্ম। লালেরা সাঁওতাল হলেও খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল। (এই ঘটনা ইঙ্গিত দেয় মিশনারিদের কাজকর্ম ওই অঞ্চলে শুরু হয়েছিল)। সামাজিক বিয়ে সম্ভব না হওয়ায় তারা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। লালের বোন রুকনি এরকমই ভালোবেসেছিল সিধুকে। কিন্তু বৃদ্ধিমান মেয়ে বুঝতে পেরেছিল সে হবার নয়। রুকনি খুব সাহসী ও বুদ্ধিমতী ছিল। টুকনি দিদিকে অনুসরণ করত। অন্য অনেক সাঁওতালের মতো রুকনির বাবা বিশু মাঝি সুদখোর মহাজন কেনারাম ভগতের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। রুকনি টুকনি দুই বোন ঠিক করে রেললাইনের কাজ করে তারা বাবার ঋণ শোধ করবে। কিন্তু তারা বদমাশ ইংরেজ সাহেবদের লালসার ফাঁদে পড়ে। আত্মরক্ষার জন্য আঘাত হানলে ব্রিটিশ আধিকারিক রক্তাক্ত হয়। ফলে মহেশ দারোগার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে স্বাভাবিক সামাজিক জীবনে থাকা রুকনির পক্ষে অসম্ভব হয়। সে বিদ্রোহীদের সঙ্গে থাকতে শুরু করে। পুরুষ দলে শাড়ির বদলে ধুতি পরে পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে। তার নাম হয় ‘রতনা’, একইভাবে টুকনির নাম হয় ‘টুকনাঞ্চ’।

পুরুষের ছদ্মবেশে ওদের কাজ ছিল বিদ্রোহীদের গোপন আশ্রয়ে পৌঁছানোর বেঁধে ভাত নিয়ে যাওয়া। হাট থেকে বিড়ি বা তামাক পাতা খৈনি, নুন ইত্যাদি সংগ্রহ করা। বিদ্রোহীদের কাছে পুলিশ বা মিলিটারির খবর পৌঁছে দেওয়া। কেউ কেউ দাবি করেছেন ৭ জুলাই, ১৮৫৫ মহেশ দারোগা সহ ১৯ জন খুন হওয়ার দিন ঘটনাস্থলে রুকনি

টুকনি উপস্থিত ছিল। হতে পারে। সেদিন সাঁওতালরা একতরফা লড়াই করেছিলেন। তাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন “সিধু-কানুর বোন ফুলমনির লাশ উদ্ধার করা হয় রেললাইনের ধার হইতে। শোনা যায় ধর্ষণ ও শারীরিক নির্যাতনের পর তাহাকে হত্যা করিয়া সেখানে ফেলিয়া রাখিয়া যায়।” এই ঘটনার সমর্থন মেলে সাহিত্যে এবং প্রচলিত পুরনো গানে। ‘এ ফুল দেলা ফুল/ রেলগাড়িরে দেজঃক ফুল’। তিনপাহাড়ের কাছে রেললাইনে কর্মরতা দুই মহিলা ধর্ষিতা হয়ে খুন হয়। তাদের নাম ছিল ফুলো ও ঝানো।

২৭ জানুয়ারি, ১৮৫৬ ভাগলপুরের কাছাকাছি পুরষবেশী নারী যোদ্ধার নিহত হবার তথ্য পাওয়া যায় ‘সম্বাদ ভাস্কর’ পত্রিকার ১২৫ সংখ্যায় যা প্রকাশিত হয় ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের ‘সম্বাদ ভাস্কর’ সাঁওতাল বিদ্রোহকে একেবারেই সমর্থন করেনি। কিন্তু ১৮৬১ সালের মার্চ মাসে কর্নওয়ালিশ সাহেবকে তার প্রশাসনিক রিপোর্টে উল্লেখ করতে হয় “১৮৫৫-৫৬ সালের মধ্যে দেশীয় রাজন্যবর্গ, মহাজন-জোতদারবর্গ ও উৎপীড়কবর্গের দ্বারা প্রায় ১২ হাজার সাঁওতাল যুবতি ও মহিলা ধর্ষিতা হয় এবং ৩ হাজার যুবতি ও মহিলা ধর্ষণ ও খুন হয়। এদের বলপূর্বক বাগানবাড়ি, কাছারিবাড়ি, বৈঠকবাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হতো।”

১৮৫৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি হাওড়া রানিগঞ্জ রেলপথ চালু হয়। এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ পরিচয়। দুবছরের মধ্যে ১৮৫৭-তে বাংলা ভাষায় রচিত প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের সংখ্যা হয় ছ’লক্ষ। এর একটিতেও সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি কথাও লেখা হয়নি। উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলা সাহিত্যে বীরপূজার সুত্রপাতে প্রথম স্থান পায় ১৮৫৫-র সাঁওতাল নয়, ১৮৫৭-র বিদ্রোহীরা।

সাঁওতালদের অরণ্যজীবন নিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ‘আরণ্যক’। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ‘অরণ্যবহি’। বীরভূমের প্রতিমা শিল্পী নয়ন পালের কাছে তারাশঙ্কর শুনেছিলেন সাঁওতালদের যুদ্ধের বিবরণ। শিল্পী নয়ন সে কথা শুনেছিল তার বাবার কাছে। তারাশঙ্করের কলমে উঠে আসে রুকনি আর টুকনির কাহিনি। দুই বোন সিধু-কানুকে ভালোবাসত। সিধুর ইচ্ছা ছিল রুকনিকে সাগাই করার। কিন্তু রুকনি ভেবেছিল অন্য কথা। সিপাহির ছদ্মবেশে সে ব্রিটিশ ফৌজের সুলুকসন্ধান এনে দিত বিদ্রোহীদের কাছে। সেজন্য পিয়ালপুরের যুদ্ধে সাঁওতালরা জিতেছিল। তারপর সংগ্রামপুরের যুদ্ধে কানু ইংরেজদের গুলিতে নিহত হলে গুরুতর আহত সিধুকে নিয়ে রুকনি জঙ্গলে লুকোয়। দুজনে ধরা পড়ে। সিধুর ফাঁসি হয়। রুকনি ইংরেজদের নাগপাশ থেকে কোনোরকমে বেরিয়ে আসে। কিন্তু অনন্ত শূন্যতা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। গ্রামের লোকজন তাকে ভালো চোখে দেখেনি। সিধুর স্ত্রী ফুলু তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। এই অনুকম্পা থেকে সে মুক্তি পেতে বেছে নিয়েছিল আত্মহত্যার পথ। এইভাবেই তারাশঙ্কর তাঁর কাহিনি শেষ করেন। কিংবদন্তিতে পরিণত হয় রুকনি টুকনি। ইতিহাসের পাতায় নামগুলো লেখা না থাকলেও খোদিত হয়ে আছে মানুষের হৃদয়ে।

অন্য সংস্কৃতি

খড়কুটো

—গত সংখ্যার পর

চার বিকেলের রোদ মরে আসছে। এই সময়ে হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলো গমগম করে রুগিদের বাড়ির লোকের বকবকানিতে। বেলা রুগির বাড়ির লোকের কাছ থেকে চা খাবার টাকা নিয়ে নিচে নেমে আসে। হাসপাতালের গায়েই রাস্তার ওপারে শ্যামসায়র। তার চারধারে দোকানের সারি। দোকানে দোকানে বিকেলের খরিদারদের ভিড়। বেলা গ্লাস ভর্তি করে চা নেয়। অলকাও এসেছিল চা নিতে। দুজনে চা নিয়ে পুকুরঘাটটায় বসে।

অলকা বলে—তুমি তো ভালোই আছো বেলাদি। একা থাক, আমার মতো ছেলে, ছেলের বউদের যত্নগা তো ভোগ করতে হয় না।

—শুনতেই ভালো একা থাকি। ভালো থাকি। কিন্তু অসুখ-বিগুখ হলে কাউকে পাশে পাবার নেই। ব্যাঙ্কে দু’চার হাজার টাকা জমানো ছাড়া আর কিছুই নেই। তাতেও বোনপোটা এসে মাঝে মাঝে ভাগ বসায়। ওকে দু’পাঁচশো টাকা মাঝে মাঝে দিতে হয়।

—কেন? বোনপো তোমার কাজ করে না?

—কাজ করবে না কেন? কাজ করে। কিন্তু দিদিটা আমার খুব ভুগছে। তার টি.বি. হয়েছে। একটু ভালো মন্দ খাবার তো তাকে দিতে হয়। তাই বোনপো চাইলে না করতে পারি না।

—বোনপো তোমার টাকা নিয়ে দিদিকে খাওয়ায় তো না মদ গিলে পড়ে থাকে?

—মদ উদ তো খায় না শুনেছি। চাষিবাসি ঘরের ছেলে অত নেশা করার দিকে ঝোক নেই। রুগ্ন দিদিটাকে তো কিছু দিতে হবে।

দুই অসমবয়সী বন্ধু গল্প করতে করতে হাসপাতালে ঢোকে। আটটা বাজলে তবে ছুটি।

বেলা হাসপাতাল থেকে ফিরে তالا খুলে ঘরে ঢোকে। ঘরের ভেতরটা ভ্যাপসা গরম। ছোট জানালাটা খুলে দেয়। দড়িতে ঝোলানো কাপড়-চোপড়

ধারাবাহিক উপন্যাস

কাকলি ঘোষ

নিয়ে গলখরে যায়। চার বালতি জল নিয়ে ধারামান করে। তারপর দুটো ফুটিয়ে খেয়ে বিছনা করে। পাখাটা জোরে চালিয়ে শুয়ে পড়ে। এই গরমে মশারি টাঙাতে আর ইচ্ছে করে না বেলার। মশা মারার ধূপটা জ্বালিয়ে নেয়। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। শুয়েও কী ঘুম আসে ছাই। নানা কথা মনে পড়ে। কতদিন হলো সে চলে গেছে। তা প্রায় সাত আট বছর তো হবেই। তাদের বাড়ি ছিল মুসুরি গ্রামে। জমি-জায়গা বিশেষ ছিল না। গ্রামেই একটা ছোট মুদিখানার দোকান ছিল কর্তার। বৃড়ি শাশুড়ি আর ওরা দুজন। পেট চলে যেতে তিনজনের ভালোমতোই। শাশুড়ি খারাপ মানুষ ছিল না। তবে ছেলে-পুলে হয়নি বলে মাঝে মাঝে খেঁচা দিত। আর দেবে নাই বা কেন? ছেলেপুলে ছাড়া কী সংসার মানায়? সবই কপাল। ছেলের জন্য কী কম চেষ্টা করেছে। কত ঠাকুরবাড়ি, মাদুলি, তাবিজ যে যা বলেছে করেছে। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। তারপর বোনপোকে নিয়ে যা হোক ভুলে ছিল। তিনজনের সংসারে যখন বোনপোটা আসত আনন্দের জোয়ার বহিত। শাশুড়িমাও ভালোবাসত ছেলেটাকে। কর্তাও মুখে সোহাগ না দেখালেও বোনপো এলে দোকান ফিরতি মাছ, মাংস, মিষ্টি এটা সেটা নিয়ে আসত। তারপর যে কী হলো? কর্তার শরীরটা দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল। প্রায়ই জ্বর আসত, খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে এলে ডাক্তারবাবু বললেন কর্তার ক্যানসার হয়েছে। এত বড় রোগের চিকিৎসা করানোর টাকা কোথায় পাব? দোকান বাঁধা দিয়ে হাজার পঞ্চাশেক টাকা নিয়ে বোনপোকে সঙ্গে নিয়ে কোলকাতায় বড় হাসপাতালে ভর্তি করল। ঘটি, বাটি মায় বাস্তু ভিটে পর্যন্ত বাঁধা পড়ল। এত চেষ্টা করেও ছয় মাসের বেশি বাঁচাতে পারল না কর্তাকে। ছেলের মৃত্যুর শোক সইতে না পেরে

শাশুড়ি চোখ বুজল এক মাসের মাথায়। শ্রাদ্ধ-শাস্তি চুকে গেলে ও চলে এল শহরে। বস্তিতে ঠাই মিলল। দিদি বলেছিল ওর কাছে থাকতে। কিন্তু ভাবলো বোনপোর একার রোজগারে আবার ভাগ বসানো। মন সায় দিল না বেলার। বেলা রাজি হল না। শহরের বস্তিতেই উঠে এল সে, প্রথম প্রথম এখানে দমবন্ধ হয়ে আসত ওর। কোথায় গ্রামের খোলামেলা পরিবেশ আর কোথায় শহরের এই ঘিঞ্জি বস্তি। কিছুদিন পর কাজের চেষ্টা শুরু করল ও। প্রথম ক’দিন লোকের বাড়ি ঝি-গিরিও করেছে। কিন্তু ও কাজ করতে খুব লজ্জা হল। একদিন গ্রামের এক লোকের চোখে পড়তে লজ্জায় মাথায় কাটা যায় আর কি বেলার। আর হাজার টাকা মায়নের ঝি-গিরি করে ঘর ভাড়া মিটিয়ে পেটের খোরাক কি চলে? যতই একটা পেট হোক। তারপর একে তাকে ধরে হাসপাতালের বদলি আয়ার কাজটা পেয়ে যায়। আসল আয়াকে দৈনিক একশো টাকা দিতে হয় বাকি দেড়শো টাকা তার। এই টাকা জমিয়েই ঘরে একটা চৌকি কিনেছে। একটা গ্যাস, একটা ছোট আলমারি, একে একে অনেক জিনিসই করেছে। একটা টিভি কেনার ইচ্ছে আছে। যদি এভাবে দু’শিফট ডিউটি পায় তাহলে তাও একদিন হয়তো কিনে ফেলবে ও। নানা ভাবনায় দুলাতে দুলাতে বেলা ভাবে একলা জীবনটা কতদিন এমনি করে বয়ে নিয়ে যাবে। তারপরই ভাবে একা তো কী হয়েছে? এই বস্তির এতগুলো মানুষকে যে কাছে পায় তাই বা কম কী? তারা একে অপরের দুখে সুখে থাকে। টাকা না থাকলেও তাদের মতো মানুষদের মন আছে। এখানে অনেকদিন হলো ও আছে। সবার সঙ্গে একটা আত্মীয়তা হয়ে গেছে। মনে মনে বলে একা কেন হবো সবাই আছে। পারুল, সন্দ্যা, নন্দিতা দিদিমণি সবাই সবাই...। সবাই তাকে ভালোবাসে। যে মানুষ ভালোবাসা পায় সে কখনো একা হয় না। ধীরে ধীরে দু’চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে বেলার। বেলা ঘুমিয়ে পড়ে।

(চলবে)

ছড়ায় ছড়ায় পরিবেশ

শিবাশীষ গুপ্ত

‘ছড়ায় ছড়ায় পরিবেশ’ কবি সনৎ ভট্টাচার্যের লেখা একটি ছড়ার সংকলন। নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য ফাউন্ডেশন, কলকাতা থেকে দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। বর্ধমানের কবি। বর্ধমান সহ মফস্বলের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দীর্ঘদিন ধরে লিখে চলেছেন, বহু পত্র পত্রিকায় প্রশংসিত। পরিবেশ আজকের দিনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্নাতকস্তরের আবশ্যিক বিষয় হিসেবেও পাঠ্য। তবু পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলায় বর্গিদের হান্সামায় কবিরা লিখেছিলেন— ‘খাজনা দেব কিসে’। কলকাতায় যখন জাপানি বোমা পড়েছিল, সেই সময় পরাধীন ভারতের ছড়াকার ব্রিটিশ বিরোধিতায় লিখেছিলেন—‘বোমের ভেতর কেউটে সাপ/ব্রিটিশ বলে বাপরে বাপ!’ আজ বর্গিরা, ব্রিটিশরা সশরীরে নেই। কিন্তু আমরা বিপন্ন। মানুষকে সচেতন করতে তিনি বলেছেন—“আকাশে নীল আভা নেই/ ঢালছে লাভা ওজন/ মনের দুখে ঢুলছে গাছ/ থামছে পাখির কূজন।” মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার মাটি ও ফসলের দূষণের কারণ। পলিথিন, অল্পবৃষ্টি, খাবারে রঙ জনিত দূষণ, বাতাসের দূষণ, দূষণ চারদিকে!

“শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছি মোরা/ পঁচিশ হাজার বার./ কেমন বাতাস টানছি সবাই/ খোঁজ রাখ কি তার?” সমুদ্রে বর্জ্য দূষণ কী করে হয়? “পুকুরগুলো করছি দূষণ/ফেলছি আবর্জনা,/ নদ ও নদী করছে দূষণ/ শিল্প ও কারখানা।” “দূষিত সব নদীর জল/ সাগরেতেই পড়ে,/ বিযক্রিয়া ঘটে সেথায়/ মাছ যাচ্ছে মরে।”

হাসপাতালেও বর্জ্য দূষণ—“সিরিঞ্জ, গ্লাভস বিক্রি হয়/ ব্যবহারের পরে,/ কেনার লোক রোজই ঘোরে/কেনে ওজন দরে।” “চত্বরেতে পুষছে শুকর/ ঘুরছে নিয়ে ছানা,/ ইঁদুর বিভাল মনের সুখে/ করছে আনাগোনা।” খেলার মাঠেও দূষণ “গোটা বিশ্ব উঠলো নড়ে/ ক্রিকেট বেটিং নিয়ে,/ দেশের মুখে লেপছে কালি/ মুছবে কিবা দিয়ে।”

সবার উপরে আছে মগজ দূষণ, “আরো একটি ঘটছে দূষণ/ সবার ঘরে ঘরে,/ টিভি দেখে ঘোরায় মাথা/ মগজ দূষণ করে।” দূষণ আছে সমাজ ঘিরে।

এমনকি কর্মসংস্কৃতি বিহীন অফিস, চিকিৎসায় অবহেলা। রয়েছে মানসিক দূষণের ছবি। “নিজের কাজটি নিয়মিত/ করতে হবে ভাই/ দূষণ মুক্ত গড়তে অফিস/ লক্ষ্য থাকা চাই।” সামাজিক অবক্ষয় কুরে কুরে যাচ্ছে সমাজকে, মানুষের মননকে। তাই তিনি লিখেছেন— “নিজের কথাই ভাবে যে/ একলা ঝেঁড়ে বলে,/ সবাই তাকে রাখে দূরে/ এড়িয়ে যায় চলে।”

সমস্ত দূষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে, সতর্ক হতে ছোটো থেকেই যাতে শিশুরা সচেতন হতে পারে, সেজন্য তাঁর বক্তব্য- “ক্লাসে সবাই হয়না প্রথম/ একজনকেই পাও/



পড়াশোনার সাথেই তাই/ আচার শিখে নাও।” “মানবতা! সুন্দর পৃথিবী দাও ফিরিয়ে।/ চেতনা! দাও সবার হাতে হাত মিলিয়ে।”

সাহিত্যের অতি প্রাচীন শাখা ছড়া। মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত বাংকারময় শব্দগুচ্ছ। যিনি ছড়া লেখেন তাকে বলা হয় ছড়াকার, এখানে বলা হয়েছে কবি। ‘ছেলেভুলানো ছড়া’, ‘ঘুম পাড়ানি ছড়া’, আবার আছে লৌকিক ছড়া। লোকছড়ার গাঁটছড়ায় বেঁধেছেন আমাদের। চারপাশে দূষিত জল, নষ্ট ভূমি, বিযাক্ত বায়ু, বৃক্ষহীন প্রান্তর বিদারী শব্দের প্রাচুর্য। একে বিদীর্ণ করে শুভ সকাল কিভাবে আনা যায়, সেই কথাই বলতে চেয়েছেন তিনি। ছোটোদের সঙ্গে বড়দেরও তাই অতি প্রয়োজনীয় বইটি।

‘ছড়ায় ছড়ায় পরিবেশ’ সনৎ ভট্টাচার্য। নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য ফাউন্ডেশন ব্লক-৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা। মূল্য ৩৫ টাকা।

ভাষাদিবসের কবিতা

ব্রীহি দাশগুপ্ত

কবিতার মুহূর্ত যদি জন্মায়
অপরিচ্ছন্ন বুপড়িতে, অথবা
অপরিসর ফুটপাথে,
প্রান্তিক বস্তির লজ্জাহীন কলতলায়,
যেখানে রোজ টাইমকল বেআক্র করে ভাষার শৌখিন বিন্যাস;
অর্ধনগ্ন শিশুরা ভদ্র আবর্জনা থেকে খুঁজে পাওয়া
বাতিল ফুটবলে লাথি মারে উজ্জ্বাসে—
যাদের ভাষা তৈরি হয়না কোনো মার্জিত ব্যাকরণে
শিক্ষা শুধু ক্ষুধার মিড ডে মিল—
কবিতার মুহূর্ত যদি জন্মায় সেইখানে, তাহলে
শব্দ বাক্য উঠে আসুক সেই সব আলোকসজ্জাহীন ক্লেদ মেখে
ভাষার রূপট ভদ্রতা আর
শ্রীলতার বিধানকে তোয়াক্কা না করে।

কবিতার প্রতি সৎ থাকতে হলে
তাকে নিরাভরণ করো অবলীলায়;
নাগরিক গম্বুজে উঠে
বাতাসে ছন্দ-শব্দ ছড়ানো হয়েছে ঢের
পরিশীলিত মুখোশে—
সেই সব শব্দ, ছন্দ, মাত্রা
আরক্ত ভূমি না ছুঁয়ে
ভেসেছে কুলীন অস্পৃশ্যতায়।

তাই, কবিতার সাথে শঠতা না করে
তাকে থাকতে দাও ক্লীবতার উষর জমিতে।
জীবনের এত কিছু যদি না ঘটে প্রতিষ্ঠান মেনে,
এত কিছু যদি অপ্রত্যাশিত দুর্যোগ,
তাহলে কবিতাকেও উন্মুক্ত করো প্রতিষ্ঠান থেকে;
কবিতার প্রতিটি মুহূর্ত হোক উদ্ভ্রান্ত, অনিয়ম
কবিতার প্রতিটি ভাষা হোক
একেকটি অকস্মাৎ দুর্ঘটনা।

জীবন নদী

দেবব্রত হাতী

জোয়ার ভাটার জীবনটাতো
উথাল পাথাল নিয়ম করে।
ক্ষণেক জোয়ার উথলে পড়ে
ক্ষণেক ভাটার অথৈ চরে।
ভাগ্য নদীতে জোয়ার এসেই
আবার যে সেই ভাটার টানে।

জীবন চলার আঁকে বাঁকে
সোজা কিন্না বন্ধুর পথে।
ধাপ কেটেকেটে অতিক্রম করা
অজানা পথে শত বিপদ ভরা।
পথ যেথায় থামিয়ে দেয় ভাবা
শেষ থেকে আবার শুরু করা।

বাঁচতে চাওয়া অন্তরের তরঙ্গে
নিদ্রাহীন স্বপ্ন নিয়ে ভালো থাকা।
কুয়াশা ঢাকা জীবন নদী পাড়ে
মৃত্যুর দ্বারে অপেক্ষায় আলিঙ্গনে।
মৃত্যু ভয় সাথে বাঁচার আকুতিতে
অনন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মেশে।

নাব্যতা

আশীষ কুন্ডু

পথের-ও নাব্যতা থাকে বুঝিনি
বুঝিনি সময় থাকতে পথের ভাষা!
আজ বহুদিন পর, সবুজপথ—
ডেকে নিয়ে গেলো—
শতযোজন দূর
ইতিহাস পেরিয়ে অনামগঞ্জ
গভীরতা অসীম নীল ওখানে!
ডুবুড়বু সূর্যের অবগাহনে—
আমার প্রেক্ষিত মন টোল খেলো,
অনাবিল সুখ গুটিগুটি পায়ে!
আমি হারিয়ে যেতে যেতে
দেখলাম ভাঙা আকাশের কোণ
ওখানে অশ্রুপ্রপাত,
কাল বয়ে যায় এক নদী
শেষবেলায় গোধূলি রঙ মেশা জল,
আমরা কেউই এই নাব্যতা বুঝিনি মনের—
যে পথ দিয়ে হেঁটে যায় ভালবাসা।

ঢেউ

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

নিজস্বতায় নদী, ঢেউ আসে, যায়
বেঁচে আছে কতো স্মৃতি, মনের পাতায়
ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাল্মা হাসি, শুধু আলোছায়া
বুকজুড়ে বানভাসি, ভালোবাসা-মায়ী
খেলা ঘর ভেসে যায়, ভেসে যায়, ভাসে—
স্মৃতিময় এই পথ, থাকো বিশ্বাসে
বিশ্বাসে দীপ জ্বলে, আলোকিত ঢেউ
ঢেউয়ে ভাসি, কাছে আসি, দূরে ডাকে কেউ।

মধ্যরাতে তারা

দিলীপ সাঁতরা

তোমরা বলো ঘরে থাকতে
মৃত্যুর দেখাও ভর
মৃত্যু সে কি ক্ষুধার চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর?
মধ্যরাতে তারাকে বলে মাধাই
ও ভাই পেট যে বড়ো বালাই।
প্রায় বছরখানেক কাজ যে নাই
চিন্তা সংসার কী করে চালাই।

বর্ষার আগমনী বার্তা নিয়ে অতিথিরা



নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ জুন : কোন আবাহবিদ বা হাওয়া দপ্তরের দিকে নয়। বর্ষার জন্য গ্রামবাসীরা তাকিয়ে থাকেন তাদের অতিথিদের আগমনের দিকে। অতিথিরা গ্রামে আসতে শুরু করলেই তারা বুঝে যান যে বর্ষা দোরগোড়ায় এসে গেছে। এবার আমন চাষ শুরু করতে হবে। এরকম ঘটনা ঘটে আসছে দীর্ঘ ৪০ বছর কালনা-১ নং ব্লকের কাঁকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মানিকহার গ্রামে। এই গ্রামের অতিথিরা হল বাঁক বাঁক পরিযায়ী পাখি। এরা প্রতি বছর বর্ষার আগমনী বার্তা নিয়ে মানিকহার গ্রামে আসে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গ্রামের ভিতর বিভিন্ন

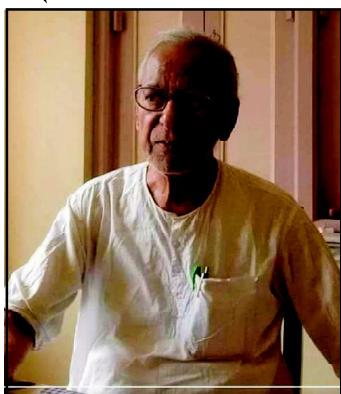
গাছ-পালায় বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, বাচ্চা ফেটায়। আশপাশের জলাশয়ে চরে বেড়ায়। মাছ, গুলি-শামুক এনে বাচ্চাদের খাইয়ে বড় করে তোলে। বর্ষা শেষে গ্রাম ছেড়ে চলেও যায়। বর্ষার আগমনী বার্তা দেয় বলেই এরা কৃষক বন্ধু। ফলে এই পরিযায়ী পাখিরা মানিকহার গ্রামের অতিথি। এই সামখোল জাতীয় পাখির মাংস অতি সুস্বাদু। তাই চোরা শিকারীদের উৎপাতও খুব বেশি। চোরা শিকারীদের হাত থেকে পাখিদের বাঁচাতে গ্রামবাসীরা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। তারা বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কেউ পাখি মারলে তাকে জরিমানা দিতে হবে।

মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের প্রচার জাঠা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ জুন : মোদী সরকার সব থেকে বেশি কর আদায় করে পেট্রোল পণ্য থেকে। তারপরেই ওষুধ শিল্প থেকে। ফলে ওষুধের দাম আকাশ ছোঁয়া। গরিব ও সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভরা। সারা রাজ্য জুড়ে এক মাস ব্যাপি জাঠা চলে। ২৩ জুন শেষ দিনে বর্ধমান সংগঠনের প্রতিনিধিরা রাজবাড়ি থেকে কাজন গেটে জাঠা শেষ করে। এখানে একটি বিক্ষোভ সভা করে সংগঠন। বক্তব্য রাখেন সি.আই.টি.ইউ-র পক্ষে নজরুল ইসলাম, দীপঙ্কর দে, সংগঠনের জেলা সভাপতি কৌশিক ব্যানার্জী, সম্পাদক অচিন যশ প্রমুখ।

বিশিষ্ট শিক্ষক দিলীপ মুখোপাধ্যায় প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ জুন : ইংরাজি ভাষার বিশিষ্ট শিক্ষক দিলীপ মুখোপাধ্যায় ২৪ জুন বর্ধমানের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি সাক্ষাৎ স্কুলে শিক্ষকতা করতেন এবং গৃহশিক্ষক হিসাবে বহু ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ গড়েছেন। সরল সাদাসিধে জীবনে অভ্যস্ত এই জ্ঞানতাপস বর্ধমানে এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় নাম। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তাঁর স্ত্রী ও এক কন্যা বর্তমান। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক, মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ সুকুতি ঘোষাল প্রমুখ। নতুন চিঠির পক্ষ থেকেও তাঁর



ব্রাতা সমর মুখোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে শোক জ্ঞাপন করা হয়।

ঘনিষ্ঠ সিপিআই(এম) দরদীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৫ জুন : সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটি এলাকার ঘনিষ্ঠ পার্টি-দরদী জ্ঞানেন্দ্র বিশ্বাসের জীবনাবসান হয়েছে। তিনি বেশ কিছুদিন আগে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী, তিন কন্যা ও পাঁচ পুত্র বর্তমান।



একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড কম্পোজিং, অফসেট

ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 7908059947 (Fazlul), 8918256074 (Madhu)

: E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

প্রান্তজন—আত্মজন (৬০)

রত্না রশীদ

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, এমনই দৃশ্য ছড়িয়েছে বর্তমানের পরিবেশ-প্রতিবেশ।

পালিয়ে যাওয়া পছন্দ করি না। বরং পাড়ি দিই শৈশবে।

একদিন, তখন বোধহয় থ্রি/ফোরে পড়ি। চৈত্র মাসের রামনবমীর মনোহর দাসের বাৎসরিক মহোৎসবে তিন মামার পরিবার সমেত আমাদেরও সপরিবার সোনামুখি যাবার রেওয়াজ।

বাপি এসব বুটবামেলায় কোনোদিনও থাকতো না।

মা আমাদের ভাই-বোনদের সঙ্গে নিয়ে মামাদের সঙ্গে যেতো। আমার মা পুরো পরিবারের একমাত্র মেয়ে।

আমি আবার মায়ের একমাত্র মেয়ে। মামার গুপ্তিতে একখানা ছোটোখাটো ভিআইপি।

ভাগি বলতে এই এক পিসু। যেখানে যতো স্পেশাল আদর-যত্ন, ভালোবাসা,

উপহার-টপহার সব টেনে এনে এই টুকুন ভিআইপি-র ঘাড়েই ঢাল।

রীতিমতো পক্ষপাতিত্ব হতো আমার পক্ষে অন্যান্য কাজিনদের বুভুক্ষু রেখে।

চক্ষুলজ্জাহীন। জলখাবারের সবার হাতে মুড়ি-তরকারির সঙ্গে একটা রসগোল্লা,

আমার একার পাতে চারটে—ও একমাত্র রাজকন্যে। লজ্জা পেতো, কান্না পেতো

আমার। একটা মিষ্টি কোনোক্রমে গিলে আমি কঁদতে কঁদতে উঠে যেতাম।

কি জানি কেন, আমার অসীম কান্না পেতো, গলা বুঝে আসতো যন্ত্রণায়, মনে হতো

আমার সব কাজিনরা কেন সমান সমান পাবে না? ওদের মনে কতো কষ্ট হচ্ছে!

একটু বড়ো হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম—

—এমন দুই দুই করো কেন এক জায়গায়?

—তুই একমাত্র ভাগি আমাদের, তাই।

—এটা কোনো কথা হলো? ওরা তিন মাত্র—চার মাত্র বলে ওদের এমন ছোটো করবে?

—আরে তুই মেয়ে। কোথায় কাদের বাড়ি বিয়ে হয়ে চলে যাবি, খেতে দেবে কি দেবে না ভালো করে, তাই আমরা

তোকে আমাদের আশ মিটিয়ে খাওয়াচ্ছি।

—আমি একা মেয়ে? আমার মামাতো দিদি-বোনগুলোও তো মেয়ে, ওদের তো আমার সমান দিচ্ছে না—

—ওরা ওদের মামার বাড়ি গিয়ে স্পেশাল আদর খাবে। তোকে নিয়ে

আচ্ছা জালা—এ্যাতো কথা তোর মাথায় আসে কোথেকে? তোর কি

আদর-যত্ন নিতেও কষ্ট হয়?

—হয়ই তো। সব সময়ই হয়।

তোমরা আমার ভাই-বোন-দিদিগুলোর চোখে চাওনা কখনো, তাই

বোঝো না কিছু যে কি অন্যায়টাই না করছে, ওরা হাসিমুখে খেয়ে উঠে যায়,

এতো কাণ্ডের পরেও আমাকে ভালোবাসে, এটা আমার জন্যে একটা

শাস্তি। সবাইকে সমান ভালো না বাসলে আমি আর তোমাদের বাড়ি আসবো না।

যা বলছিলাম শুরুতে। তখন থ্রি কি ফোরে পড়ি।

গুপ্তিসূদ্ধ সবাই নিয়মমাফিক মোচ্ছবে যাবে। এবারে

আমার মা যেতে পারবে না, আমার মেজোভাইটা

মাত্রই দু'মাস হলো হয়েছে। মা ওকে নিয়ে ছ'মাসের আগে, ওর অল্পপ্রাণনের আগে বাইরে বেরোবে

না। তাই মা যাবে না। আমার পরের ভাইটাও তিন/সাতের তিন।

ও মাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। তিন মামার পরিবার তখন আমাকে পাকড়ে ধরে

নিয়ে গেলো—মায়ের প্রতিনিধি হিসেবে। আমাদের বাদ দিয়ে মোচ্ছব

হবেই না। আমাদের যাবার যতো না আগ্রহ, মামাদের তার শতগুণ, মা

আত্মদী বোনের মতো নিরুদ্বেগ থাকতো, আর মামারা এসে রাত দশটা

পর্যন্ত আমাদের স্যুটকেস, ব্যাগ এসব গুছিয়ে দিয়ে যেতো।

ভোর হতে না হতে রিক্সা নিয়ে হাজির, চল্ পানসি

বেলঘড়িয়া।

...খেই হারিয়ে যাচ্ছে বারবার। তো সেবার আমাদের বাড়ির থেকে কেউ

গেল না বলে মামারা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। তখন বর্ধমান থেকে তিন

রকম রুটে সোনামুখী যাওয়া যেতো। ১) দামোদর নৌকোতে

পেরিয়ে ওপার থেকে বাস ধরে সেহারা বাজার থেকে

বিডিআর রেল ধরে সোনামুখী রেল স্টেশন।

ওখান থেকে মামার বাড়ি মনোহরতলা অনেক দূর। ২) রেল

পানাগড়ে পৌঁছে শালি নদী পেরিয়ে ওপার থেকে বাস ধরে কত ঘুরে ঘুরে

সোনামুখী ৩) রেল দুর্গাপুর পৌঁছে বাসে করে বেলিয়াতোড়।

তারপর বেলতোড়ে বাস পাঁটে অন্য বাসে করে সোনামুখী।

বেলতোড়ে নেমে সবাই মিলে মেচা সন্দেশ খাওয়া হতো। এই রুটেই বেশিরভাগ সময় যাওয়া

হতো। রেলের পাস থাকতো সবার। খরচা কম পড়তো।

আর ছেলেপুলে লটবহর নিয়ে নদী পেরোবার ঝুঁকি, ঝুঁকিও কম নয়।

আর বহু পরে কৃষকসেতু তৈরি হবার পর বাঁকুড়া মোড় হয়ে

সোনামুখী যাবার রাস্তা তৈরি হলো। তখন মামাবাড়ি যাবার গল্প অনেকটাই

গুটিয়ে এসেছে।

মামাদের সঙ্গে মামাবাড়ি পৌঁছতে সন্ধ্যা রাত হয়ে গেলো। আমাদের দেখে

দিদার চোখে জল। সবাই দল বেঁধে মনোহরতলায় মচ্ছব দেখতে গেলো।

সেদিন পাড়ার ছেলেদের নাটক আছে। দিদা আমার হাত ধরে বললো—তুই

আমার সঙ্গে যাবি।

দিদা একটা হ্যারিকেন নিয়ে গোয়ালে মঙ্গলার কাছে গেলো—“মা,

একটু দুধ দাও মা, আমার নাতনিটা এই এলো”—গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে

একগ্লাস দুধ এনে, ফুটিয়ে জলে বসিয়ে ঠাণ্ডা করে সেই অমৃত আমার মুখে

ধরলো। হাউ হাউ করে কান্না পেয়ে গেলো আমরা।

...এই জন্যে দিদা তুমি আমাকে আটকালে। এখানো, —এই

ভাবে তুমি আমাকে স্পেশাল আদর করবে?

মুখে বলিনি কিছু। দুজনে অনেকক্ষণ কঁাদলাম মায়ের জন্য।

ভাইদের জন্য, আরো কার কার জন্যে—কে জানে!

(চলবে)

চার দশক ধরে নীরবে মানুষের সেবা করে চলেছেন ডাঃ গীম্পতি চক্রবর্তী

কিশোর মাকর : জটিল রোগে ভুগছিলেন ৫৫ বছরের বিধবা মহিলা হাসিনা বিবি। খোসবাগান গেলে সর্বস্বান্ত হবে জেনে দশ টাকার ফি দিয়ে ডাক্তার গিম্পতি চক্রবর্তীকে দেখাতে আসেন। মঙ্গলকোট-এর ঠাণ্ডাপারা গ্রামের হাসিনা বিবি লিভার রোগে আক্রান্ত। অনেক ভুগে বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। শেষে ডাক্তারবাবুর নিখরচায় সেবায় আবার জীবন ফিরে পায়। ছেলের কাছ থেকে এক কেজি সুগন্ধি চাল নিয়ে ডাক্তারবাবুর হাত দুটি ধরে উপহার তুলে দেন। তখন ডাক্তারবাবুর চোখে জল চিকচিক করছে। “তুই আমার ব্যাটা, তোকে আল্লাহ পাঠিয়েছে।” ডাক্তারবাবু বাকরুদ্ধ হয়ে যান। তাঁর কাছে এ এক চরম প্রাপ্তি।

এভাবেই গরিবের ডাক্তার সহনাগরিকের পাশে দাঁড়িয়ে মানবধর্ম পালন করে যাচ্ছেন। সহনাগরিকের পাশে থাকা কর্তব্যটুকু পালন করছেন মাত্র—বলে জানান বিনয়ী ডাক্তারবাবু।

তিনি দশ টাকার ফিস্ কে ২০ টাকা করেছেন রোগীদের চাপে। প্রাণখুলে রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। অনেকে ফিস্

দিতে না পারলেও সেই। তাঁদেরকে পাওনা স্যাম্পল ফাইল দিয়ে সহায়তা করেন। মানুষকে স্বল্পমূল্যের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া

সরকারের দায়িত্ব বলে তিনি মনে করেন।

ডাক্তার চক্রবর্তী একজন চিকিৎসক, সম্পাদক, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। বর্ধমান শহরে রয়েছেন প্রায় চার দশক ধরে।

বিশ্ববিদ্যালয় হেলথ সেন্টারে প্রধান চিকিৎসক হিসেবে চাকরি নেন। যাদবপুরে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি হয়ে পরে

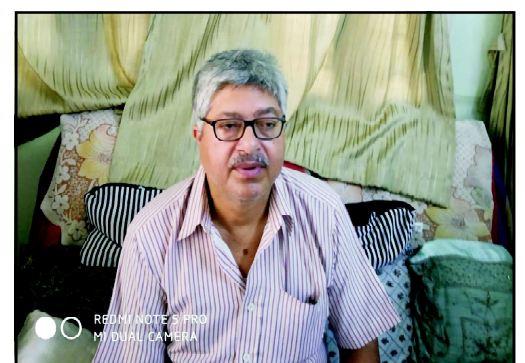
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শান্তি মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বৃন্দাবন, ২২ জুন : বি.জে.পি-র দুই মুখপাত্রের হজরত মহম্মদ সম্পর্কে উদ্ভাসনিমূলক ও অব্যঞ্জিত

মন্তব্যের প্রতিবাদে গলসী-১নং এরিয়া কমিটির উদ্যোগে

বামফ্রন্টগত ভাবে বিকাল ৪-টা থেকে বৃন্দাবন বাজারে মিছিল ও

পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক মানুষ অংশগ্রহণ করেন।



শিক্ষকদের অনুপ্রেরণায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজে পড়তে আসেন ডাক্তারি। ডাক্তারি পাশ করে রয়ে গেলেন বর্ধমান। তারপর থেকে মানুষের সেবার সাধনা। রোগ প্রতিরোধের উপর বেশি জোর দিয়ে গ্রামে, গ্রামে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সাথে তিনি যুক্ত। আজও সুন্দরবনে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনকে জোরদার করতে নিয়মিত ছুটে যান। এজন্য জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখেন। শিবস্বন্দর সেবা সমিতিতে আজও সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। ‘স্বাস্থ্য ও মানুষ’ পত্রিকার তিনি সম্পাদক। তাঁর কথায় যতদিন বাঁচব সহ নাগরিকদের পাশে থেকে সামান্য চিকিৎসা দিয়ে সেবা করে ক্ষম।